সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ● সেপ্টেম্বর ২০১৬ ● দুই টাকা

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প
ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বাংলাদেশ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী আজ মৃতপ্রায়। ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের কারণে তিস্তা পারের হাজার হাজার মানুষ হাহাকার করছে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা অববাহিকায় নেমে এসেছে চরম বির্পযয়। মেঘনার উজানে ভারতের বরাক নদে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের চেষ্টা হয়েছিল। এখন আরেক বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, যার নাম আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প। ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ মহাপরিকল্পনা অনুসারে ছোট-বড় ৩৮টি নদীকে ৩০টি সংযোগকারী খালের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে। পরিকল্পনার মূল দিক হচ্ছে নদীর এক অববাহিকার উদ্বৃত্ত পানি অন্য অববাহিকায় যেখানে ঘাটতি রয়েছে, সেখানে স্থানান্তর করা। এর আওতায় আন্তর্জাতিক নদী ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা থেকে পানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে খরাপ্রবণ এলাকা গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থান, তামিলনাড়ুতে।

অনেকদিন ধরে প্রস্তাবনার আকারে থাকলেও সম্প্রতি ভারত এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠেছে। বিজেপি সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রী উমা ভারতী গত ১৬ মে ২০১৬ বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রধান নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে খরাপ্রবণ এলাকায় পানি পৌঁছানোই এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের কাজ। ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই ভারতের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে – কেন্দ্রীয় সরকার আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী সংযোগ প্রকল্প 'মানস-সংকোশ-তিস্তা-গঙ্গা'র কাজ শুরুর উদ্যোগ নিয়েছে। এ ঘোষণা দেয়ার সময় তৎকালীন পানিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, "এ সংযোগ প্রকল্প শুধু এ অঞ্চলের কৃষি ও পানি প্রাপ্যতাকেই সহজ করে তুলবে না, একইসঙ্গে তা দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে বিশাল পরিমাণ পানি চালান করবে।" মানস ও সংকোশ হল ব্রহ্মপুত্রের দুটি উপনদী, যার পানি সরিয়ে নেয়ার অর্থ হল ব্রহ্মপুত্রে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়া।

নদী সংযোগ প্রকল্পের ইতিকথা

১৯৮০ সালে ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় যে জাতীয় পরিকল্পনা তৈরি করে তাতে প্রথম নদীগুলোর আন্তঃসংযোগের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দুই বছর পর গঠন করা হয় 'ন্যাশনাল ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি' নামে এক সংস্থা। এই সংস্থার উপর নদী সংযোগের সম্ভাব্যতা এবং বিভিন্ন কারিগরি, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত দিক সম্পর্কে জরিপ চালানোর দায়িত্ব পড়ে। ভারত সরকার এর পেছনে ১ হাজার কোটিরও বেশি রুপি খরচ করেছে। ফলে এদের সমীক্ষা রিপোর্টে নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে জোর দেয়া হয়েছে। ১৯৮৭, ১৯৯৩ ও ২০০১ সালে প্রণীত জাতীয় পানি নীতিতে এই প্রকল্পের উল্লেখ করে এক অববাহিকা থেকে অন্য অববাহিকায় পানি নিয়ে যাওয়ার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

নদী সংযোগ প্রকল্পের ধারণাটি বিশেষভাবে বেগবান হয় ১৯৯৯ সালে

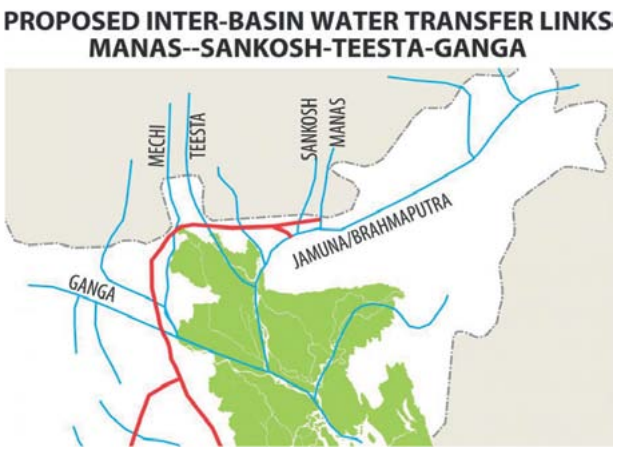

ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে এন.ডি.এ. জোট দেশটির কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসার পর। রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মত হিন্দীভাষী ও খরা প্রধান এলাকাগুলোতে ভোট পাওয়ার জন্যে বিজেপি এই প্রকল্পকে বিশেষ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে অনেক বছর ধরে। এই প্রকল্পের জন্যে তারা টাস্কফোর্স গঠন করে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ জোট ক্ষমতায় এসে এই প্রকল্প নিয়ে ধীরে চলো নীতি নিয়েছিল। তবে ২০১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সেদেশের সুপ্রিমকোর্টের একটি বেঞ্চ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য মনমোহন সিং-এর সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সর্বোচ্চ আদালত ওই প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করারও নির্দেশনা দিয়েছে। আন্তঃসংযোগের জন্যে উল্লেখিত নদীগুলো যে আন্তর্জাতিক নদী এবং তার বিশাল অববাহিকা জুড়ে অন্যান্য দেশের মানুষও বসবাস করে এবং অভিন্ন নদীর পানির যে কোনোরূপ ব্যবহার যে তাদেরও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশনা দেওয়ার সময় সে বিষয়টি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে জিও হাইড্রোলজিক্যাল প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের যে রেওয়াজ রয়েছে, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে নির্দেশনা দেওয়ার আগে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সেটিও এড়িয়ে গেছে।

নদী সংযোগ প্রকল্পের রূপরেখা

এ প্রকল্পের আওতায় ৩৮টি নদ–নদীকে ৩০টি সংযোগ খাল দ্বারা সংযুক্ত করা হবে। যার মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ১৫ হাজার কিলোমিটার। এদের মধ্যে কিছু নদীর উৎপত্তি হিমালয় থেকে, এদেরকে বলা হয় হিমালয়ান নদী। এই নদীগুলোকে ১৪টি খালের দ্বারা সংযোগ ঘটানো হবে। বাকি নদীগুলো দক্ষিণ ভারতের। এদেরকে বলা হয় পেনিনসুলা নদী। এদেরকে ১৬টি খালের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে। তৈরি করা হবে ছোট বড় ৩ হাজার জলাধার। খালগুলো ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মত প্রশস্ত হবে। গভীরতা হবে প্রায় ৬ মিটার। প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ১১ লক্ষ কোটি রুপি। সংক্ষেপে বললে, পরিকল্পনা বা প্রকল্পের দুটি বড় অংশ আছে। গঙ্গা ও তার কয়েকটি উপনদী যথা গন্ডক, ঘাগরা, সারদা ও যমুনা নদীকে খাল কেটে সংযুক্ত করা হবে। এ পানি সুদূর রাজস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রকল্পের দ্বিতীয় অংশে আছে ব্রহ্মপুত্র নদী। গঙ্গা ও তার উপনদী থেকে যে পানি সরানো হবে, তা পূরণ করা হবে ব্রহ্মপুত্রের পানি দ্বারা। সে ক্ষেত্রে দুটি খাল খনন করা হবে– (১) মানস-সংকোষ-তিস্তা সংযোগ ও (২) যোগী ঘোপা-তিস্তা-গঙ্গা সংযোগ খাল। গঙ্গার তুলনায় ব্রহ্মপুত্র নিচু দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাই পাঁচটা ধাপে ব্রহ্মপুত্রের পানিকে ১০০ মিটার উচুঁতে তুলে তারপর গঙ্গায় ফেলা হবে। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্রের পানির মাধ্যমে পূরণ করা গঙ্গার পানি প্রবাহ কিন্তু ফারাক্কা দিয়ে বাংলাদেশে আসবে না, চলে যাবে সুদূর দাক্ষিণাত্যে। ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে সংযোগ খাল কেটে ওড়িশার সুবর্ণরেখা ও মহানন্দার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হবে। তারপর *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গ্যাসের দাম বাড়িয়ে মুনাফা করার বাহানা জনগণ মানবে না – বাম মোর্চা

"গ্যাস খাত একটি লাভজনক সেক্টর, গত অর্থবছরে এ খাত থেকে কর-ভ্যাট ও লভ্যাংশ বাবদ প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। অথচ, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গ্যাসের দাম প্রায় ২৭% বাড়ানোর পর বছর না যেতেই আবারো দ্বিগুণ মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব আনা হয়েছে। সাধারণ মানুষ, এমনকি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়েরও প্রতিবাদকে তোয়াক্কা না করে মহাজোট সরকার স্বেচ্ছাচারী কায়দায় অযৌক্তিক ও গণবিরোধী এ প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করলে তাকে তীব্র গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হবে। উন্নয়নের নামে সরকারের লুটপাট-দুর্নীতির খরচ যোগাতে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটার এ নীতি মানুষ মেনে নেবে না।" গ্যাসের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। মোর্চার ডাকে গত ১০ আগস্ট সকাল ১১টা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত কাওরানবাজারস্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও বাসদ(মার্কসবাদী) নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গ্যাসের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সামনে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে

নদী বাঁচাও - কৃষক বাঁচাও - দেশ বাঁচাও

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের নামে বাংলাদেশকে মরুভূমি করার চক্রান্ত রুখে দাঁড়ান। ভারত কর্তৃক নদীর পানি প্রত্যাহার ও সরকারের নতজানু নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

২-৫ অক্টোবর ২০১৬
ঢাকা-কুড়িগ্রাম
রেলমার্চ
সফল করুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প : ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বাংলাদেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর) মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও ভাইগাই নদ–নদীগুলোকে সংযুক্ত করে কর্ণাটক, কেরেলা, তামিলনাড়ু রাজ্যে পানি সরবরাহ বাড়ানো হবে।

বাংলাদেশের উপর আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব

দেশের সকল বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডেকে আনবে। আমাদের পানির উৎস প্রধানত তিনটি : আন্তর্জাতিক নদীপ্রবাহ, বৃষ্টি এবং ভূগর্ভস্থ পানি। এর মধ্যে নদীপ্রবাহের অবদান দু'তৃতীয়াংশের বেশি (৭৬.৫%)। বাকি দু'টোর অবদান যথাক্রমে ২৩% ও ১.৫%। বলা বাহুল্য, সাগরের পাশাপাশি নদীর পানি বাষ্পীভূত হয়েই বৃষ্টিতে পরিণত হয়। ভূগর্ভস্থ পানির ভাণ্ডারেও নদীর অবদান বিশাল। নদীসংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র উভয় নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করা হবে। এ দুই নদী দিয়ে বর্ষাকালে পানি আসে দেশের মোট পানিপ্রবাহের প্রায় ৮০ ভাগ, শুকনো মৌসুমে ৯০ ভাগেরও বেশি। ফলে বাংলাদেশে ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্পজনিত ক্ষয়-ক্ষতির অর্থনৈতিক মূল্যের চেয়েও প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় বড় হয়ে দেখা দেবে।

মরুকরণের দিকে যাবে বাংলাদেশ, বাড়বে বন্যার প্রকোপ

গঙ্গানদীতে ফারাক্কা বাঁধ দেয়ার ফলে ইতোমধ্যে দেশের উত্তর–পশ্চিমাঞ্চল শুকনো মৌসুমে পানি সংকটের শিকার হয়েছে। আন্তঃনদী সংযোগ খাল করে ভারত সরকার যদি ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রবাহ প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে বাংলাদেশের কৃষি ভীষণভাবে ব্যাহত হবে এবং শিল্প উৎপাদন, সেচ, বনায়ন, মৎসসম্পদ প্রভৃতির ওপর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সারাদেশের নদী অববাহিকা অঞ্চলে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বড় ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনবে। কালক্রমে মরুকরণের দিকে ধাবিত হবে দেশ। পানি সংকটের কারণে নদী সমূহের নাব্যতা হ্রাস পেয়ে তলদেশের উচ্চতা বেড়ে যাবে। ফলে, বর্ষা মৌসুমে অতি বর্ষণের পানি ধারণ করতে না পারায় বন্যার প্রকোপ বাড়বে এবং নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি হবে।

কমে যাবে পলি পরিবহন – বাড়বে লবণাক্ততা – ধ্বংস হবে সুন্দরবন

শত সহস্র বছর ধরে নদী বাহিত পলল দ্বারা গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। এখনও এর গঠন প্রক্রিয়া চলছে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মায় পানি প্রবাহ কমার ফলে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহই পলির একটা বড় অংশ সাগরে বয়ে নিয়ে যায়, যে কারণে ভূমি গঠন এখনও চলছে। ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রবাহ কমে গেলে ভূমি গঠন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে, তা সুনিশ্চিত। সমুদ্র থেকে যে লবণাক্ত পানি জোয়ারের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে তা অপসারণ করতে নদীর স্বাভাবিক মিঠা পানির প্রবাহ প্রয়োজন। তাতে লবণ পানি আবার সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে। প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে দেশের নদ–নদীতে পানি শুণ্যতা দেখা দেয়, ফলে লবণাক্ততা বাড়তে থাকে। সে কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট অনুযায়ী খুলনা অঞ্চলের প্রধান কয়েকটি নদীতে গত কয়েক বছর ধরে লবণাক্ততা বৃদ্ধির হার ৫০ শতাংশ। এর ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় স্বাদু পানির অভাবে সুন্দরবনের সুন্দরী বৃক্ষরাজি আগামরা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সুন্দরবনকে বলা হয় দেশের ফুসফুস। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট শত ঘূর্ণিঝড়–জলোচ্ছ্বাস বুক দিয়ে আগলে রক্ষা করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে। ফলে এই বনের বিনাশের সাথে সাথে ধ্বংস হবে দেশের জীববৈচিত্র্য, বাড়বে প্রলয়ংকারী ধ্বংসাত্মক ঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ, লক্ষ লক্ষ মানুষ হারাবে তাদের জীবিকা।

বিপর্যয় নেমে আসবে পুরো কৃষি ব্যবস্থায়

আমরা জানি, বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের রয়েছে বিস্তীর্ণ সমভূমি আর উর্বর নদীপলল সমৃদ্ধ মৃত্তিকা। বৃষ্টিবহুল উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু এদেশকে উৎকৃষ্ট কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। এক সময় এদেশের মাটিকে বলা হত সোনার চেয়েও খাঁটি। কিন্তু আজ আমাদের দেশের কৃষকরা কৃষিজমিতে সেচের জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছে না। গঙ্গায় পানি প্রত্যাহারের কারণে ইতোমধ্যেই দেশের অন্যতম বৃহত্তম সেচ প্রকল্প গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প (G.K.project) এলাকায় পাম্পিং ক্যাপাসিটির প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলে মাটির আর্দ্রতা কমে যাওয়ার কারণে ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলসহ দেশের অনেক এলাকায় গভীর–অগভীর কোনো নলকূপে পানি পাওয়া যাচ্ছে না, পানির স্তর আশঙ্কাজনক ভাবে নিচে নেমে গেছে। চাষীরা ভীষণভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত তিস্তা ব্যারেজ আজ অচল। কারণ ১০০ কিলোমিটার উজানে গজলডোবা নামক স্থানে তিস্তা নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারত। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে। প্রথম ধাক্কাটা আসবে সেচসংকট থেকে। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার (ব্রহ্মপুত্র–পদ্মা–মেঘনার মিলিত প্রবাহ) ১৮ জেলা উচ্চ ফলনশীল বোরো চাষের জন্য বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল। এ প্রকল্পগুলো ৩ লাখ ৫২ হাজার ৩৭ হেক্টর জমিতে পানি সরবরাহ করে। ব্রহ্মপুত্রে পানি সংকট হলে এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা পাট চাষের জন্য বিখ্যাত। পাট চাষ ও পচানোর কাজে প্রচুর পানি লাগে। এতদিন ব্রহ্মপুত্র তা যুগিয়েছে। তাই ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে পাটচাষও বন্ধ হয়ে যাবে। অন্যদিকে, দেশে বর্তমানে যে শত শত প্রজাতির মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায় ব্রহ্মপুত্র তার একটা বড় অংশের প্রজনন স্থল। নদী সংযোগ প্রকল্প কৃষির পাশাপাশি এই মৎস্যসম্পদকেও বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেবে।

আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত হবে গোটা দেশ

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণের প্রধান কারণ ভূগর্ভস্থ পানির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা। নদীতে পানিপ্রবাহ কমে গেলে তা আরও বেড়ে যাবে। ফলে পানির স্তর আরও নিচে নেমে যাবে এবং মাটির নিচের পানিতে বেড়ে যাবে মরণব্যাধি বিষ আর্সেনিক। ভূ–গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের ফলে ক্যান্সারসহ মানবদেহে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির বিস্তার ঘটবে। ২০০৩ সালের ১৯ আগস্ট দৈনিক প্রথম আলো কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্ত্তীর এক সমীক্ষা রিপোর্টের বরাত দিয়ে বলে, বাংলাদেশ-ভারত ও নেপাল এই তিন দেশের গঙ্গা-মেঘনা- ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ৫৫ কোটি মানুষ মারাত্মক আর্সেনিক দূষণজনিত ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশেই আছে প্রায় ৬ কোটি মানুষ। এখানে আর্সেনিক দূষণের কারণে প্রতি হাজারে ১৩ জনের ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞগণ একমত হন যে, বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণের ব্যাপকতা নজিরবিহীন। প্রায় ২ লক্ষেরও অধিক মানুষের শরীরে ইতোমধ্যেই আর্সেনিক আক্রান্ত রোগের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিয়েছে।

উদ্বাস্তু হবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পটি নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। 'ভূতাত্ত্বিক, পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প' শীর্ষক গবেষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লক হ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.মোঃ খালেকুজ্জামান, অর্বান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনিত শ্রী বাস্তব ও ইউনিভার্সিটি অব মিসিসিপি মেডিক্যাল সেন্টারের ফজলে এস ফারুক। তাদের গবেষণায় বলা হয়েছে, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারাবে। ফারাক্কা বাঁধের আগে বাংলাদেশের নদ-নদীগুলো বছরে গড়ে আড়াই বিলিয়ন টন পলি সাগরে বয়ে নিয়ে যেত। এখন এটি কমে দাঁড়িয়েছে দেড় বিলিয়ন টনে। নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এ পলির পরিমাণ আরো কমে যাবে। এতে সাগরের লোনা পানি আরও উপরে উঠে আসবে, সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের তিন গবেষক ফ্যারন গুর্দজি, কেরি নোলটন ও কোবি প্লাত "ইন্ডিয়ান ইন্টার লিংকিং অব রিভার : এ প্রিলিমিনারি ইডোলি উমান" শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সুন্দরবন তলিয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া ভূগর্ভের পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাবে।

ব্রিটিশ পত্রিকা গার্ডিয়ান গত ১৮ মে ২০১৬ এক প্রতিবেদনে লিখেছে, এ প্রকল্প গঙ্গা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের ভাটিতে বসবাসকারী ও জীবন-জীবিকার জন্য নদীর ওপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের ১০ কোটি মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব ফেলবে।

খোদ ভারতীয় পানি বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবাদীরাও আন্তঃনদী সংযোগের বিরোধিতা করছেন

ভারতের পরিবেশবাদীরা প্রথম থেকেই এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছেন। এ নিয়ে তারা সেখানে আন্দোলন করছেন। আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ভারতের পরিবেশবিদ বন্দনা শিভা বিজনেস টুডের সাথে এক সাক্ষাৎকারে (১৩ মার্চ ২০১৪) মন্তব্য করেছিলেন, 'আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বড় ধরনের ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থার নামান্তর মাত্র'। তিনি আরো মন্ত ব্য করেছিলেন 'এটা একটা দুর্নীতির মহাপ্রকল্পের প্যাকেজ, যেটা ভারতের জীবন নির্ধারণী ইকো-সিস্টেমকে ধ্বংস করবে'। আরেকজন পরিবেশবিদ 'ওয়াটার ম্যান অব ইন্ডিয়া' খ্যাত রাজেন্দ্র সিং, ভারতীয় দৈনিক 'দ্যা হিন্দু'-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে (১০ জুন ২০১৫) বলেছেন, 'এটা আমাদের দেশের জন্য ধ্বংসাত্মক। এ প্রকল্প একদিকে বন্যা, অন্যদিকে খরার কারণে বহু মানুষকে উদ্বাস্তু এবং তাদের অবর্ণনীয় ক্ষতি করবে। নদী কোনো রাস্তা নয়, তার একটা জীবনচক্র আছে। আন্তঃনদী সংযোগ ভারতের পানিসম্পদকে ব্যক্তিমালিকানার পথে চালিত করবে'।

ড.লাথা অনন্থা (ডিরেক্টর অব রিভার রিসার্চ সেন্টার)'র মতে, এ প্রকল্প ভারতের নদীভিত্তিক প্রতিবেশের জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে। তিনি বলছেন, সরকার দেশের ভূগোলকে নতুনভাবে আঁকতে চাইছেন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বন্য প্রাণী এবং ভাটির দিকে থাকা কৃষকের কি হবে? নদীকে শুধু পানির উৎস হিসেবে দেখলে হবে না, দেখতে হবে পূর্ণাঙ্গ ইকোসিস্টেম হিসেবে। নদী সংযোগের জন্য যে অসংখ্য খাল খনন করতে হবে, তার জন্য প্রতিবেশকে অস্বীকার করতে হবে। এটা অর্থের অপচয়। উদ্বৃত্ত পানি দেখিয়ে যে পরিমাণ পানি সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সে হিসেবের মধ্যেও অতিরঞ্জন আছে।

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প আন্তর্জাতিক নদী আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন যেসব নদী দুই বা ততোধিক দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাদের বলা হয় আন্তর্জাতিক নদী। বাংলাদেশের ৫৪টি নদী ভারত থেকে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। অভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত ১৯৬৬ সালের হেলসিংকি নীতিমালায় বলা হয়েছে, প্রতিটি অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্র অভিন্ন নদীগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন বিবেচনায় নেবে। ১৯৯২ সালের ডাবলিন নীতিমালার (আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত) ২নং নীতিতে বলা হয়েছে, পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সবার অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের জলপ্রবাহ নীতিমালা কনভেনশন অনুযায়ী প্রণীত আইনে বলা হয়েছে, নদীকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাবে না যাতে অন্য দেশ মারাত্মক ক্ষতি বা বিপদের মুখে পড়ে। নদীর পানিপ্রবাহ যে দেশগুলোর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সে সব দেশ স্ব স্ব ভৌগোলিক সীমানার ভেতর ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ভাবে নদীর পানিপ্রবাহকে ব্যবহার করবে। কোনো পরিকল্পনা বা প্রকল্প গ্রহণ করলে (যেমন- বাঁধ নির্মাণ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি) করলে, সে সম্পর্কে অপর দেশগুলোকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা থাকবে। আলোচনার মাধ্যমে নদীর ব্যবহার বিষয়ক যে কোনো সমস্যা বা আপত্তির সুরাহা করবে। এসব আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও আইনের তোয়াক্কা না করে ভারত একতরফাভাবে নদীসংযোগ পরিকল্পনা অগ্রসর করছে। অথচ, চীন কর্তৃক ব্রহ্মপুত্রের উৎস সাংপো নদীর উপর বাঁধ দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের ঘোষণায় ভারত সরকার জোরালো আপত্তি জানিয়েছে, বাংলাদেশকে আপত্তি জানানোর অনুরোধ করেছে।

ভারতীয় জনগণের নাম নিয়ে মূলত ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থেই প্রণীত হচ্ছে এই আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

নদীসংযোগ প্রকল্পের পেছনে ভারতীয় শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী –কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পথিকৃৎ' নামক সাময়িকীতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল মেরা গেলডিন বলেছিলেন, 'এই শতাব্দীতে যদি যুদ্ধ হয়ে থাকে তেল নিয়ে তাহলে আগামী শতাব্দীতে তা হবে পানি নিয়ে'। বর্তমান সময়ে কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলা হয়ে থাকে, পানির অপর নাম জীবন। অথচ এই পানিই দিন দিন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। '১৯৯৮ সালে ২৮টি দেশে জলের অভাব ছিল। ২০২৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ৬০-এর কাছাকাছি। ১৯৭০ সালের পর মাথাপিছু জল পাওয়ার পরিমাণ কমেছে ৩৩ শতাংশ।'(পথিকৃৎ, ... বর্ষ ----সংখ্যা)

সাধারণ জনগণের জন্য এটা দুঃসংবাদ সন্দেহ নেই। তবে সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানিগুলোর জন্য এ এক দারুণ খবর। এর মধ্যে তারা বিরাট ব্যবসার সন্ধান পাচ্ছে। ফলে বিশ্বব্যাপী সুপেয় পানির উৎসগুলোকে দখল বা নিয়ন্ত্রণ করার কাজ তারা শুরু করে দিয়েছে। এই জলবাণিজ্যে কী পরিমাণ লাভ হতে পারে বিশ্বব্যাংক ইতোমধ্যে তা হিসেব করে ফেলেছে। তাদের হিসেবে প্রতিবছর এ অংকটা দাঁড়াবে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার অর্থাৎ ৬ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। এ জন্য তারা প্রথমেই দেশে দেশে সরকারি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বেসরকারিকরণ করার ব্যবস্থা করছে। তাদের আশা এভাবে বিশ্বব্যাপী একটা মুক্ত জলবাজার গড়ে তোলা যাবে।

নদীসংযোগ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সুরেশ প্রভুর বক্তব্য অনুসারে, দেশী-বিদেশী কর্পোরেট হাউজগুলো এই প্রকল্পের সমস্ত স্তরেই অংশগ্রহণ করবে। 'তারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন, জল সরবরাহ, জল ব্যবহারকারীদের ফোরাম গড়ে তুলে তাদের কাছে জল বিক্রি ইত্যাদি সব কাজই করবে'। পথিকৃৎ এর ভাষ্য অনুযায়ী, 'নদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের আগেই দেশের নদীগুলোকে কর্পোরেট হাউজগুলোর হাতে একে একে তুলে দেওয়া হচ্ছে। নদী সংযোগ প্রকল্পের এক একটি বা একাধিক ক্যানেলকেও এইভাবে তুলে দেওয়া হবে কর্পোরেট টাইকুনদের হাতে'।

এ আলোচনার পর নিজের দেশের জনগণ ও বিজ্ঞানীমহলকেও অন্ধকারে রেখে এই বিশাল প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য বুঝতে কিছু বাকি থাকে কি?

শুধু দ্বি–পাক্ষিক আলোচনা নয়, প্রয়োজন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে নিজেদের দাবি জোরালো ভাবে উত্থাপন ও আইনি লড়াই

গতবছর জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফরের সময় ৬৫ দফা সম্বলিত যে যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়েছিল (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

রামপাল প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে জনস্বার্থের বিবেচনা নেই

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) এটা খালি চোখে দেখে সিদ্ধান্ত টানা যায় না। খালি চোখে বোঝার উপায় আছে কি ঢাকার বাতাস মারাত্মক মাত্রায় দূষিত? দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে বড়পুকুরিয়ার পরিবেশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু সেই কাজ না করেই ঢালাও সার্টিফিকেট দেয়া কতটা যৌক্তিক বা সমীচীন!

সবচেয়ে বড় কথা, যেকেনো বন আর সুন্দরবন এক নয়। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। আমাদের দেশে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বুক আগলে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরবন পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের বনের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। সবাই জানেন, জোয়ার-ভাটার লোনা ও মিঠা পানির ওপর নির্ভরশীল এ ম্যানগ্রোভ বন অত্যন্ত সংবেদনশীল। আর একথা বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত – যত উন্নত প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক্ তা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ফলে সৃষ্ট বায়ু, পানি ও মাটি দূষণকে পুরোপুরি রোধ করতে পারে না। এজন্যই আমেরিকার মত উন্নত প্রযুক্তির দেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপরই বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা সাজাচ্ছে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দিচ্ছে।

আন্দোলনকারীদের অর্থের উৎস সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য সম্ভবতঃ তাঁর নিজের দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। ন্যায়সঙ্গত লড়াইতে যখন মানুষ নামে, তখন টাকার লোভে সে চলে না, বিবেকের তাগদেই মানুষ আসে, দায়িত্ব নেয়। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে সামষ্টিক কল্যাণ কামনা থেকে মানুষ কোনো কাজ করতে পারে, জনগণের অর্থসাহায্যে কোনো আন্দোলন পরিচালিত হতে পারে – এসব তাঁর ধারণার বাইরে।

প্রধানমন্ত্রী সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনে বিএনপি-র সমর্থনের উল্লেখ করে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িয়ে ন্যায্য এই আন্দোলনকে বিতর্কিত ও কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছেন। তিনি একথা ভালো করেই জানেন – সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনে এতদিন খালেদা জিয়া ছিলেন না, ছিল জনগণ। আজ রামপাল প্রশ্নে বিএনপি যে অবস্থান নিয়েছে, তার সাথে জাতীয় কমিটির বিগত কয়েক বছরের ধারাবাহিক লড়াইয়ের চরিত্রগত পার্থক্য সচেতন মানুষ বোঝেন। অতীতে গ্যাস-কয়লা-বন্দর রক্ষার যে আন্দোলন হয়েছে, তা আওয়ামী লীগ-বিএনপির গৃহীত নীতির বিরুদ্ধেই হয়েছে। নিকট অতীতে বিএনপির দমন-পীড়ন মোকাবেলা করেই ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। সেই রক্তস্নাত গণঅভ্যুত্থানের সময়ে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিলেন, ক্ষমতায় গেলে তাঁর দল আন্দোলনকারীদের সাথে চুক্তি বাস্তবায়ন করবে। তিনি অবশ্য তাঁর সে প্রতিশ্রুতি রাখেননি।

বামপন্থীদের অণু-পরমাণুতে বিভক্ত হওয়া প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষকে আপাত বাস্তব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু, তাতে কি বামপন্থীদের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনের যৌক্তিকতা খারিজ হবে? বামপন্থীদের শক্তি সীমিত হতে পারে, কিন্তু তাদের গড়ে তোলা এ আন্দোলন যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রাণের দাবিকে প্রতিফলিত করছে – তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। না হলে প্রধানমন্ত্রীর এ সংবাদ সম্মেলন করার প্রয়োজন হতো না। ক্ষুদ্র শক্তি হলেও বামপন্থীদের অবস্থান জনস্বার্থের পক্ষে, আর বিরাট শক্তি ও ঐতিহ্য নিয়েও আওয়ামী লীগের অবস্থান আজ জনগণের আকাঙ্খার বিরুদ্ধে। ফলে, কেবল সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে ন্যায্যতা নির্ধারিত হয় না। পরিশেষে বিনীতভাবে আমরা বলতে চাই, বামপন্থীদের মধ্যে যারা আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রগতিশীলতা খোঁজেন, মৌলবাদ-জঙ্গীবাদসহ নানা প্রশ্নে তাদের ডাক এড়াতে পারেন না – তাঁরা যেন আওয়ামী লীগের চরিত্র ও তার চোখে নিজেদের অবস্থানটি বুঝার চেষ্টা করেন। এটি অনুধাবন করা গেলে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে স্বাধীন অবস্থান নিয়ে গণআন্দোলনের পথে বামপন্থীদের ঐক্য স্থাপিত হবে এবং লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা কার্যকর রাজনৈতিক শক্তিকে তখন কেউ আর 'অণু-পরমাণু' বলে কটাক্ষ করতে পারবে না।

গ্যাসের দাম বাড়িয়ে মুনাফা করার বাহানা জনগণ মানবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর) সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হেসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা ফিরোজ আহমেদ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, বাসদ-এর কেন্দ্রীয় নেতা মহিনউদ্দিন লিটন, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার প্রমুখ।

অবস্থান কর্মসূচিতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, "বিইআরসি-তে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে গ্যাস কোম্পানির প্রতিনিধি ছাড়া প্রায় সব বক্তা ও বিশেষজ্ঞরা তথ্য-যুক্তি দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। এরপরও দাম বাড়ানো হলে আরেকবার প্রমাণিত হবে এ গণশুনানি প্রহসন ছাড়া কিছু নয়।" তাঁরা বলেন, "ভবিষ্যতে গ্যাসখাতের উন্নয়নের জন্য তহবিল প্রয়োজন – এ অজুহাতে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হচ্ছে, অথচ গ্যাস উন্নয়ন খাতে কয়েকহাজার কোটি টাকা অব্যবহৃত পড়ে আছে। জনগণের করের অর্থে প্রণীত রাষ্ট্রীয় বাজেট ও উন্নয়ন বরাদ্দ থেকেই এ ব্যয় নির্বাহ করা উচিত।" তাঁরা আরো বলেন, "মহাজোট সরকার জরুরি ভিত্তিতে দেশের স্থলভাগ ও সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান-উত্তোলন ত্বরান্বিত না করে ব্যয়বহুল আমদানির পথ ধরেছে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে কাজে না লাগিয়ে দেশের গ্যাস বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে বহুগুণ বেশি দামে কিনছে। লুটপাটের উদ্দেশ্যে সরকারের এসব কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ।"

সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয়, জনমত উপেক্ষা করে সরকার গ্যাসের দাম বাড়ালে আগামীতে জনগণকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর ও কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। গণসংযোগের লক্ষ্যে আগামী ২২ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে জনসভা-সমাবেশ-মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প : ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বাংলাদেশ

(২য় পৃষ্ঠার পর) সেখানে ২১ নং দফায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছিল যে ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ব্যাপারে এমন কিছু করবে না যাতে বাংলাদেশের ক্ষতি হয়। এখন উমা ভারতীর দেওয়া বক্তব্য ওই প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করলো।১৯৯৬ সালের গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯এর মাধ্যমে উভয়পক্ষ সম্মত হয় যে, দুই দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহমান অন্যান্য যৌথ নদীগুলোর পানি বণ্টন ও ব্যবহার দুই দেশের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই হবে। এক্ষেত্রে তারা সমতা, ন্যায়পরায়ণতা ও একে অপরের ক্ষতি সাধন না করার নীতিতে পরিচালিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারত ১৯৯৬ সালের পানি বন্টন চুক্তির অনেক ধারা রক্ষা করেনি বরং নতুন করে টিপাইমুখ বাঁধ, তিস্তার পানির একতরফা প্রত্যাহার, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশকে পানিশূণ্য করার চক্রান্ত করছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার যৌথ নদীগুলো নিয়ে ভারতের একের পর এক আগ্রাসী পদক্ষেপ নিয়ে বিভিন্ন সময় দাবি উঠেছে বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক ফোরাম অথবা আন্তর্জাতিক আদালত বা ট্রাইবুন্যালে নিয়ে যাওয়ার। বাংলাদেশ ফারাক্কা ইস্যুটি নিয়ে জাতিসংঘের মত বৃহৎ ফোরামে গিয়েছে এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের অবস্থানের সপক্ষে প্রস্তাবনাও গৃহীত হয়েছে। আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় বাংলাদেশ ভারতের সাথে কার্যকর কোনো সমাধানে আসতে পারেনি। একইসাথে ভারত, চীন, নেপাল, ভুটানসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে যৌথ আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে। কার্যকর করতে হবে যৌথ নদী কমিশন। কিন্তু বর্তমান ও অতীত সরকারগুলোর এসব বিষয়ে লক্ষ্যণীয় কোনো উদ্যোগ-তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি।

বন্ধুত্বের কথা বলে অথবা ভোটের স্বার্থে ভারত বিরোধীতা করলেও সব শাসক দলই সাম্রাজ্যবাদী ভারতের কাছে নতজানু থেকেছে

বর্তমান সরকার ভারতকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নৌবন্দর ও রাস্তা ব্যবহারের সুযোগ, বিদ্যুৎ করিডোর, রামপালে সুন্দরবন বিনাশী বিদ্যুৎপ্রকল্প, ভারতীয় বিদ্রোহীদের দমন, সমুদ্রের দু'টি গ্যাসব্লক ভারতীয় কোম্পানিকে ইজারা ইত্যাদি নানা সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা ভারতের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি। সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যাসহ দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। এখানকার বাজার ভারতীয় পণ্যে সয়লাব হয়ে গেছে। বর্তমান মহাজোট সরকার, অতীতের বিএনপি-জামায়াত, জাতীয় পার্টি কোনো সরকারই ভারতের কাছ থেকে অভিন্ন নদীর পানি আদায়ে দৃঢ় অবস্থান নেয়নি। শাসক বুর্জোয়া দলগুলো লুটপাট ও গদি দখল নিয়েই ব্যস্ত, জাতীয় স্বার্থ, জনস্বার্থ বা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ক্ষমতায় যাওয়া ও থাকার জন্য এ অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতের শাসকশ্রেণীর আনুকূল্য লাভের জন্য আওয়ামী লীগ-বিএনপি প্রতিযোগিতা করে। বাংলাদেশের পুঁজিপতিরাও ভারতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িয়ে মুনাফা করতে চায়। ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে এদেশের কৃষকসহ সাধারণ মানুষের জীবন ও প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ বিপর্যস্ত হবে– তাই এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। নেই বলেই এতদিনেও আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও জোরালো কোনো প্রতিবাদ দৃশ্যমান হলো না।

দেশের অভ্যন্তরেও নদী-পানিসম্পদ রক্ষা ও কাজে লাগানোর দীর্ঘমেয়াদী কোনো পরিকল্পনা শাসকদের নেই

পৃথিবীতে মিঠা পানির সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তাই অনেকের মতে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে পানির জন্য। বাংলাদেশ মিঠা পানির এক অমূল্য ভাণ্ডার। অথচ জনস্বার্থে এই সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের কোনো কার্যকর উদ্যোগ বা পরিকল্পনা শাসকদলগুলোর নেই। বরং শাসক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় অবাধে চলছে নদী-জলাশয় দখল, দূষণ, নদীভাঙন-বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে লুটপাট ইত্যাদি। ভূ-গর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত তোলার কারণে আর্সেনিক দূষণের ঝুঁকিতে আক্রান্ত কয়েক কোটি মানুষ। অন্যদিকে বিশুদ্ধ পানির সংকটকে পুঁজি করে চলছে পানি ব্যবসা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ধাপে ধাপে বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা করছে সরকার। তাই আজ নদী রক্ষার সংগ্রামের সাথে গণবিরোধী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে যুক্ত করতে হবে।

আসুন, নদী ও জীবন রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হই

নদীবাহিত পলি দিয়ে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ। শরীরে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হলে যেমন মানুষের মৃত্যু ঘটে, তেমনি নদীর পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে বা বাধাগ্রস্ত হলে ভূ-খণ্ডের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ধীরে ধীরে সেটাই হচ্ছে। সে কারণে এক সময়ের ১২০০ নদীর দেশে এখন মাত্র ২৩০টি নদী। এক ফারাক্কা বাঁধই দেশের মানচিত্র থেকে মুছে দিয়েছে ২০টি নদী। ১৯৭৬ সালে মওলানা ভাসানী লক্ষ মানুষ নিয়ে ফারাক্কা অভিমুখে লংমার্চ করেছিলেন। মাওলানা ভাসানী যে আশঙ্কা করেছিলেন, আজ তা নির্মম বাস্তব। শত হাহাকার করেও সেই প্রমত্ত পদ্মাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমরা কি নীরবে তাকিয়ে নদীর মৃত্যু দেখবো?

আসুন, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে রুখে দাঁড়াই। আমাদের দল বাসদ (মার্কসবাদী) গত কয়েক বছর ধরে তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যাসহ নদী ও কৃষি বাঁচানোর দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন করে আসছে। এর অংশ হিসেবে ভারতের আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে আগামী ২-৫ অক্টোবর ঢাকা-কুড়িগ্রাম অভিমুখে অনুষ্ঠিত হবে রোডমার্চ। এ কর্মসূচি সফল করতে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

বন্যার্তদের জন্য সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহ ও পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে ৩ আগস্ট বিকাল ৫টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে জরুরী ভিত্তিতে বন্যার্ত অসহায় মানুষদের সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিত করা ও পুনর্বাসনের দাবিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ(মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক ও সাইফুজ্জামান সাকন। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "গুলশান-শোলাকিয়ায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আতঙ্কের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ বানভাসি মানুষের মানবেতর জীবনের প্রতিচ্ছবি অনেকটা যেন দৃষ্টির আড়ালেই মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৪০ লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছে। সরকারি হিসেবে ১৬ জেলার ৫৯ উপজেলার প্রায় ১৫ লক্ষাধিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ২২ হাজার ঘরবাড়ি ভেসে গেছে। প্রতিদিন প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। ইতোমধ্যে মারা গেছে প্রায় ৪০ জন।"

সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ বন্যার্তদের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ সরবরাহ ও বন্যা সমস্যার সমাধানকল্পে স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

২৪ আগস্ট নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন

আফসানা ও তনু হত্যার বিচারসহ ৫ দফা দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের স্মারকলিপি পেশ

২৪ আগস্ট নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। এই দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র দেশব্যাপী 'আফসানা ও তনু হত্যার বিচার, বর্ষবরণে যৌন নিপীড়ন এবং নারী ও শিশু হত্যাকারী-নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত, নারী ও শিশুসহ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ৫ দফা দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছে। এর আগে রাজধানীর প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সীমা দত্ত। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিদীপা ভট্টাচার্য, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক তাসলিমা আক্তার বিউটি।

উল্লেখ্য গত চার মাস ধরে নারী শিশু হত্যাকারী নির্যাতনকারীদের শাস্তির দাবীতে সারাদেশে ৪৫ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে, অবস্থান কর্মসূচী, পথ সমাবেশ, প্রচারপত্র বিলি ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করে এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা সংগৃহিত স্বাক্ষরসহ ৫ দফা দাবি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচী পালন করে। একই দিনে রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, নোয়াখালী, সিলেট, চাঁদপুর, যশোর, জয়পুরহাট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় উক্ত কর্মসূচী পালিত হয়।

আন্দোলনে উত্তাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

হল ছাড়া আবার বিশ্ববিদ্যালয় কি?

প্রায় মাসখানেক ধরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হল প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করছে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী দিনের পর দিন রাস্তায় নেমে এই ন্যায্য দাবি উচ্চকিত করলেও এখনও পর্যন্ত সরকারের টনক নড়ছে না। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন, ধর্মঘট, সড়ক অবরোধের মতো কর্মসূচি পালন করেছে। সরকার শিক্ষার্থীদের দাবি না মানলেও সরকার দলীয় ছাত্রসংগঠন কয়েক দফা এই আন্দোলনের উপর খড়গহস্ত হয়েছে। হামলা ও ভয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছে। গত ২৮ আগস্ট পূর্বনির্ধারিত ধর্মঘট পালনকালে শিক্ষার্থীদের উপর উপর্যুপরি হামলা করে ২০ জন শিক্ষার্থীকে আহত করেছে। পরদিন একই কর্মসূচিতে হামলা চালিয়ে কর্মসূচি বানচাল করেছে। হামলায় আহত অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী মিঠুন রায় এখনো ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। হামলায় আহত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মেহরান আজাদ, পাঠাগার সম্পাদক অনিমেষ রায়।

প্রতিষ্ঠার ১১ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো হল নেই। কলেজ থাকাকালীন অবস্থায় যে ১১টি ছাত্রাবাস ছিল তা এখন বিভিন্নভাবে দখল হয়েছে। ইতোপূর্বে কয়েক বছর ধরে শিক্ষার্থীরা এই সব হল উদ্ধার করার দাবি জানালেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ বিষয়ে বরাবর উদাসীন থেকেছে। আন্দোলনের মুখে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুড়ি ছড়িয়েছে। একটি ছাত্রী হলের ভিত্তিপ্রস্তর ৩ বছর আগে স্থাপিত হলেও এখনও কাজ শুরু হয়নি। এই বিদ্যাপীঠের ২১ হাজার শিক্ষার্থীর আবাসন ব্যবস্থা কী হবে এটা সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববিদ্যালয়েরই দায়িত। কিন্তু সরকার দিন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দায়িত্ব অস্বীকার করছে। সেই লক্ষ্যে ইউজিসি'র ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি তথা স্বনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার বিরোধী। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে আয়োজনগুলো দরকার তার মধ্যে হল অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ে হলকে শুধু আবাসন হিসেবে দেখা হয় না, জ্ঞানের মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হলে অবিলম্বে শিক্ষার্থীদের হলের দাবি মেনে নিতে হবে।

রামপাল প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ক্ষমতার দম্ভ আছে জনস্বার্থের বিবেচনা নেই

সুন্দরবনের কাছে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রতিবাদে স্বাভাবিকভাবে সোচ্চার মানুষ। এই অবস্থায় গত ২৭ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলন করে সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও যেকোনো মূল্যে রামপাল প্রকল্প করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের কারিগরি দিক নিয়ে তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি ইতোমধ্যে বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন, অতীতেও বহু বিশেষজ্ঞ মত হাজির করা হয়েছে। সেদিকে না গিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি দিক আলোচনা করা যাক।

প্রধানমন্ত্রী সুন্দরবন রক্ষায় আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন – উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হননি, হলি আর্টিজানের খুনী জঙ্গীদের সাথে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যের মিল খুঁজে পেয়েছেন। এভাবে তিনি এই আন্দোলনের মধ্যে জনস্বার্থের প্রশ্নটিকে আড়াল করার অপপ্রয়াস করেছেন। প্রশ্ন হলো – যে বিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরবনের ক্ষতি করবে, তা কি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, না কি প্রকৃতি ধ্বংসের প্রকল্প? ২০০৬ সালে বিএনপি সরকারের আমলে শেখ হাসিনা যখন ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনবিরোধী আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তখন কি তিনি উন্নয়নের বিরোধিতা করেছিলেন? অথবা ১৯৮৮ সালে সামরিক স্বৈরাচার এরশাদ সরকার যখন হরিপুর তেলক্ষেত্র ভুয়া সিমিটার কোম্পানির হাতে তুলে দেয়ার চুক্তি করেছিল, তখন শেখ হাসিনাসহ এর বিরোধীরা কি তেল উত্তোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, না কি উন্নয়নের নামে লুণ্ঠনের প্রতিবাদ করেছিলেন?

শাসকরা জনস্বার্থহানিকর যা কিছু করে, জনগণের মঙ্গলের জন্য করছি এরকম বলে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও যা কিছুই করছেন, সবই তাঁর ভাষায় দেশ-জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে! গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য কয়েকগুণ কমার পরও দাম না কমানো, খরচের দিক থেকে উন্নত বিশ্বকে হার মানানো হাজার হাজার কোটি টাকার ফ্লাইওভার, বিকল্প উপায় থাকা সত্ত্বেও ব্যয়বহুল কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ফুলবাড়ির কয়লাখনি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উত্তোলনের জন্য লিজ দেয়া, গ্যাস চুক্তি এবং সর্বশেষ রামপাল চুক্তি – সবই তো জনগণের মঙ্গলার্থে! কিন্তু ভুক্তভোগী মানুষ কি এভাবে ভাবতে পারবেন?

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিবেচনায় অন্যতম উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ-এর সাফাই গেয়ে বললেন, এগুলো না হলে না কি হারিকেন জ্বালাতে হতো। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিরোধিতা কখনো কেউ করেনি। প্রশ্নটা ছিল সাশ্রয়ী বিকল্প যেমন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গ্যাসভিত্তিক বড় বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট নির্মাণ-সংস্কার-নবায়ন না করে বেসরকারি খাতের ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ কেনার যৌক্তিকতা নিয়ে। যার জন্য বছরে অন্ততঃ ৮ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হয়েছে। আবার ভর্তুকির টাকা পূরণ করা হয়েছে বারবার গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করে। দরিদ্র জনগণের স্বল্পমূল্যের ভাতের বদলে উচ্চমূল্যের পোলাও-বিরিয়ানি খেতে না চাওয়া নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়।

সুন্দরবন থেকে রামপাল নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত বলে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন। তার তো এটা জানার কথা – ভারতীয় কোম্পানি এনটিপিসি খোদ ভারতেই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে পারেনি – বনভূমি থেকে ২৫ কিমি এর কম দূরত্ব ছিল বলে। অথচ সে কোম্পানিকেই সুন্দরবনের ১৪ কিমি-এর মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্র করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – বড় দেশ ভারতের মত বাংলাদেশে অত দূরত্ব বজায় রাখার দরকার নেই। কয়লাভিত্তিক বিদুৎকেন্দ্রের ক্ষতির মাত্রা কি দেশভেদে কম-বেশি হয়? বরং ছোট, ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে ক্ষতি তো আরো বেশি হবার কথা।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বনের কাছে ও শহরের মধ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ছবি দেখিয়ে দাবি করেছেন, সেখানে কোন ক্ষতি হচ্ছে না। তাঁর দেয়া উদাহরণের মধ্যে বেশ কয়েকটিতেই ক্ষতির তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। যেমন – তাঁর উল্লেখ করা ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা করে আমেরিকান ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি। ২০১৪ সালে পানি দূষণের দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়ে এই কোম্পানি জরিমানা দেয় এবং একটি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ ও দু'টিতে দূষণ কমানোর অঙ্গীকার করে। ভিয়েতনামের কুয়াঙ্গ নিন ও তাইওয়ানের তাইচুং কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দুটির বিরুদ্ধেই মারাত্মক পরিবেশ দূষণের অভিযোগ আছে। বেইজিং শহরের বড় ৪টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩টি ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়েছে, ৪র্থটি আগাম বছর বন্ধ হবে পরিবেশ দূষণ কমানোর প্রয়োজনেই।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আট বছর ধরে বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চলছে। কিন্তু ওই এলাকায় তো গাছপালা মরেনি, পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয়নি।" বড়পুকুরিয়া আর রামপাল একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সুযোগ নেই। রামপালের গুরুত্ব সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ঘিরে। অন্যদিকে, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বড়পুকুরিয়ার চেয়ে কার্যত ১০ গুণ বড়, দৈনিক কয়লাও পুড়বে ১০ গুণ বেশি, গড়ে প্রতিদিন ১৩ হাজার টন কয়লা। আর বড়পুকুরিয়া খনির কয়লা তুলে সেখানেই ব্যবহার হচ্ছে, এতে পরিবহনজনিত দূষণ এবং ক্ষতির পরিমাণ সঙ্গত কারণে কম। কিন্তু রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়লা আসবে সুন্দরবনের ভেতরের চ্যানেল দিয়ে। লাখ লাখ টন কয়লা সুন্দরবনের আকরাম পয়েন্টে বড় জাহাজ থেকে নামানোর পর ছোট জাহাজে তা নিয়ে যাওয়া হবে বিদ্যুৎকেন্দ্রে। এতে দিন-রাতে কয়লা লোড-আনলোড আর পরিবহনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুন্দরবনের ভেতরে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য খাল-নালার পানি। আর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে বড়পুকুরিয়ার পরিবেশের ক্ষতি হয়নি – *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.sammobad.org । ই-মেইল : mail@spbm.org